প্রথম আলো

তারিখ 25 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিং-নোট বই বন্ধের আইন ও শিক্ষার সংস্কৃতি

শিক্ষা আইন

আবুল মোমেন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালেই জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিটি পরের বছর, অর্থাৎ ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সরকারের কাছে জমা দেয়। পাকিস্তান আমল থেকে এ দেশে অনেক শিক্ষা কমিশন হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গঠিত শিক্ষা কমিশনের সংখ্যাও ছয়-সাতটির মতো হবে। সব কটি নিয়ে কোনো না কোনো মহল থেকে বিতর্ক উঠেছিল এবং তাদের প্রতিবেদনগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরপর নানা আলোচনা ও বিতর্কের মুখে হিমাগারে ঠাঁই পেয়েছিল। এবারই প্রথম প্রাথমিক কিছু বিতর্ক সত্ত্বেও শিক্ষানীতিটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন মহলের আপত্তি শুনেছেন এবং তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রায় সর্বমহল কর্তৃক গৃহীত এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠিত হয় ২০১১ সালে। কাজটা অবশ্যই সহজ ছিল না। কারণ, প্রায় দুই শ বছর ধরে চলে আসা একটি শিক্ষাব্যবস্থায় বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার সুপারিশ ছিল এতে। এটি একটি বিশদ বিষয়, আমরা আজ কোচিং-টিউশন-নোট বই নিষিদ্ধ করার সুপারিশেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

এই আইনকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আশা করব এটি খসড়াতেই আটকে থাকবে না, যথাযথ প্রস্তুতিসহ কার্যকর হবে। কেননা, কেবল আইন করলেই তো হবে না, তার বাস্তবায়ন জরুরি। আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরাধ দমনের জন্য প্রচুর আইন আছে, কিন্তু তাতে অপরাধ বন্ধ হচ্ছে না। অনেক সময় আইন বাস্তব কারণেই প্রয়োগ করা যায় না, আবার বাস্তব কারণেই অনেক আইনি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা সম্ভব হয় না। বিষয়গুলোর গভীরতা ও জটিল বাস্তবতা আমাদের বিবেচনায় থাকতে হবে।

এ দেশে প্রাইভেট টিউশনের ঐতিহ্য প্রায় আধুনিক স্কুলশিক্ষার সমবয়সী। অর্থাৎ, এটি প্রায় দুই শ বছরের পুরোনো প্রথা। কীভাবে এটি গড়ে ওঠে? এই গ্রাম ও কৃষিপ্রধান দেশে আধুনিক স্কুলশিক্ষার সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতা মহানগরীতে। দেখাদেখি অন্য ছোট-বড় নগরেও ধীরে ধীরে স্কুল চালু হয়। এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে বলব। সাধারণত কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজ শিল্পপ্রধান নাগরিক সমাজের তুলনায় ইনফর্মাল বা অনানুষ্ঠানিক (সেই সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিকও বটে) হয়ে থাকে। এই সংস্কৃতির **দুর্মর** প্রভাব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সাম্প্রতিক কালের দুর্বলতা থেকেও প্রকাশ পায়।

দেখা যাচ্ছে, এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও সহায়ক ধারা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্যায়ে প্রথম প্রজন্ম থেকেই গ্রামীণ পরিবারগুলো সন্তানের শিক্ষার জন্য শহরে আত্মীয় বা পরিচিত পরিবারের সহায়তা নিয়েছে। তারাও এমন জায়গির বা লজিং মাস্টার প্রথাকে স্বাগত জানিয়েছে মূলত নিজেদের শিশুসন্তানদের লেখাপড়ার একজন তদারককারী পাওয়ার আশায়। এ নিয়ে বহু ঘটনা ও কাহিনি বাংলা সাহিত্যে ও বাংলা চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এ কেবল শিক্ষাবঞ্চিত পরিবারের প্রথম প্রজন্মের জন্যই সত্য ছিল না, দেখা যাচ্ছে ঠাকুর পরিবারের মতো শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা শহুরে পরিবারেও গৃহশিক্ষক রাখার রেওয়াজ ছিল—তাঁদের কেউ বাড়িতে থাকতেন, কেউ সময় ধরে এসে বাড়ির শিশুদের পড়িয়ে যেতেন। এর সরস বর্ণনা, রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'তে পাওয়া যাবে। এই প্রথা গত দুই শ বছরে কখনো বন্ধ হয়নি।

এই প্রথা টিকে থাকার কারণ একাধিক। প্রথমত, অনেকের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারে, তবে আমার ধারণা এটিই গুরুতর কারণ—আমাদের সমাজ (তাই পরিবার ও ব্যক্তিও) কখনো শিক্ষার মৌলিক, প্রধান ও চরম লক্ষ্য যে আজীবন শিক্ষার্থী থাকার দক্ষতা ও প্রণোদনা অর্জন, তা কখনো বুঝতে পারেনি। যে ভাষা ও জ্ঞানচর্চার সূচনা স্কুলে হয়, তার মূল উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের পরিণত মানুষটাকে বুনিয়াদি আবেগ-অনুভূতি-উপলব্ধির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ-যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতায় উত্তীর্ণ করা।

কিন্তু শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সমাজ ও সরকার কারও বিবেচনায় না থাকায় কালে কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান ও জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা অর্জন থেকে সম্পূর্ণ সরে কেবল পরীক্ষা এবং তাতে কৃতিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এর ফলে সমাজের যে সনাতন জ্ঞানবিমুখ এবং পর্যবেক্ষণ-যুক্তি-বিশ্লেষণবিমুখ ভাবাবেগনির্ভর প্রবণতা ছিল, তার পালেই একতরফা জোরেশোরে হাওয়া লেগেছে এবং তা আদতে দুই শ বছর ধরেই চলছে। এর প্রভাব পুরো সমাজজীবনের সব ক্ষেত্রেই আজও প্রকটভাবে উপস্থিত। এর ওপর আজকাল পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি, স্কুলে সরকারি সাহায্যকে যুক্ত করে দেওয়ায় পরীক্ষামুখী পাঠচর্চায় একেবারে জোয়ার চলছে। সংশ্লিষ্ট সবার ভাবনায় এর বাইরে আর কিছুই নেই বলে মনে হয়।

শিক্ষার বাজারে (দুঃখিত এই শব্দবন্ধ প্রয়োগের জন্য) জ্ঞানের পরিবর্তে পরীক্ষার ফলই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত 'সামগ্রী' হওয়ায় একে ঘিরেই বাজারের প্রবণতাগুলো নির্ধারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই বাজারই অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে চতুর পসরা সাজাতে সাজাতেই তৈরি করে নিয়েছে কোচিং সেন্টার, নোট বই এবং উদ্ভাবন করেছে পরীক্ষায় দক্ষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া—নিরন্তর মডেল টেস্ট, যা কোচিং সেন্টারের মূল কাজ। শুনেছি প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসা ধরে রাখার জন্য কোনো কোনো কোচিং সেন্টার কৃতী ছাত্রদের (থুড়ি পরীক্ষার্থীদের) ট্যাবও উপহার দিচ্ছে। এরই উপজাত হিসেবে দেখা দিয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ফলাফল প্রভাবিত করার মতো শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নানা দুর্নীতি। শিক্ষা যেহেতু মানুষ তৈরির কাজ, তাই এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট সব দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা আদতে আত্মঘাতী। বলতেই হবে, যে ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার্থীতে রূপান্তরিত করে, তার গলদগুলো ঠিক না করে কেবল আইন দিয়ে শিক্ষার নেতিবাচক উপদ্রবগুলো কি বন্ধ করা যাবে?

সমস্যা আরও রয়েছে। ওপরের বিষয়টি অনেকাংশে শিক্ষার সংস্কৃতির বিষয়, কিন্তু এতে কাঠামোগত সমস্যাও বিস্তর। এ দেশে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আদর্শ অবস্থার চেয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে। সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু এখনো সরকারি স্কুলেই শ্রেণিকক্ষে প্রায় এক শ ছাত্র নিয়ে একজন শিক্ষককে হিমশিম খেতে দেখা যায়। শ্রেণিকক্ষে অধিক ছাত্র এবং স্কুল-সময় প্রয়োজনের (বা আদর্শের) তুলনায় কম হওয়াও স্কুলে যথাযথ পাঠদানের অন্তরায়। তার ওপর রয়েছে শিক্ষকদের দক্ষতার ও কর্মস্পৃহার ঘাটতি। সর্বোপরি রয়েছে নিরন্তর পরীক্ষার চাপ। সব রকম ঘাটতি ও চাপ পূরণের জন্য কোচিং ও সহায়ক গ্রন্থের দ্বারস্থ হচ্ছেন সবাই। বলা বাহুল্য, পরিস্থিতির সুযোগ নিতে ছাড়ছে না কোনো পক্ষ, শিক্ষকেরাও নন। এভাবে সবার সহযোগিতা ও ভুল সিদ্ধান্তের যোগফল হলো আজ স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টার, শিক্ষকের চেয়ে টিউটর, পাঠ্যবইয়ের চেয়ে নোট বই এবং শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে ব্যবস্থায় পরীক্ষার একাধিপত্য চলে, সেখানে আইন প্রয়োগ ও পুলিশি অভিযান চালিয়ে কি কোচিং-টিউশন-নোট বই বন্ধ করা যাবে? বাজারের চাহিদা ও ব্যাপকতা এবং শিক্ষার প্রকৃত চাহিদা তৈরির ব্যর্থতার এই বাস্তবতায় এসব পরিপূরক-সহায়ক এবং লাভজনক ব্যবস্থা ভিন্ন চেহারায় টিকে থাকবে বলেই আশঙ্কা হয়।

সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতার বিচারে বলছি, আইন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বা মাধ্যমে আমরা কি শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিকভাবে নির্ধারণ করে চলতে পারব? পরীক্ষার ক্রমবর্ধমান চাপে পিষ্ট স্কুলশিক্ষা থেকে যে গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান গবেষণাগারের ব্যবহার, নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, এমনকি খেলাধুলা ও শিক্ষাসফর, স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশ (বা দেয়ালপত্রিকা তৈরি) প্রায় নীরবে হারিয়ে গেছে, তার ক্ষতি নিয়ে আমরা কি সচেতন? কীভাবে স্কুলশিক্ষায় মেধাবী উদ্যোগী তরুণেরা যুক্ত হবে, তার কোনো পরিকল্পনা কি আছে আমাদের? এদিকে পরীক্ষার আশু তাগিদ এবং বিপরীতে স্কুলে যথার্থ শিক্ষাদানের মতো সময় ও সুযোগের অভাব, শিক্ষকের অদক্ষতা, পরিবারের শিক্ষার সব দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণের মনোভাবের যোগফল হলো শিক্ষার উল্টোযাত্রা। বাজারে সৃষ্ট এই চাহিদা যেহেতু রাতারাতি দূর হবে না, তাই হয়তো আইন প্রণয়নের পর দৃশ্যমান কোচিং সেন্টার অদৃশ্য হবে, গাইড বই নিষিদ্ধ পুস্তকের রূপ ধারণ করবে, শিক্ষকেরা পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়িয়ে নেপথ্যে কাজ চালাবেন। বলা যায়, পুরো প্রক্রিয়াটা আরও অনানুষ্ঠানিক রূপ নেবে। আর এই ইনফর্মাল সমাজ সেটা লুফে নেবে। হয়তো সন্তানের সুশিক্ষা (অর্থাৎ পরীক্ষায় ভালো ফল) নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত-বিভ্রান্ত পুলিশ সদস্যরাও এই বাস্তবতায় করণীয় নির্ধারণেও একইভাবে দুশ্চিন্তায় ও বিভ্রান্তিতে থাকবেন। পুরো প্রক্রিয়াটা লেজেগোবরে হলে আমরা কি বিভ্রান্ত হব না, এমনকি দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হব না?

শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পর কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে: কোচিং, নোট বই, প্রাইভেট টিউশনের নিদান হিসেবে খসড়া আইনে স্কুলের ব্যবস্থাপনায় স্কুল-সময়ের পর সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সরকার-নির্ধারিত ফিতে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোতে দুই পর্বে স্কুল হয়, তার ওপর অনেক স্কুলেই কলেজ চালু হয়েছে। এই অবস্থায় নিম্ন আয়ের ক্লান্ত-শ্রান্ত-অনুদ্দীপ্ত (demotivated) শিক্ষককুল এতে কি আকৃষ্ট হবে? আর সরকার ও গণমাধ্যমের আশকারায় পরীক্ষার ফল নিয়ে মত্ত 'ভালো ছাত্র', তাদের ফলানুরাগী ও তাতেই মশগুল অভিভাবকেরা এবং শিক্ষা নিয়ে অন্ধ চিন্তায় আচ্ছন্ন সমাজ কি হঠাৎ আইনের চোখরাঙানিতে ঘুম থেকে জেগে উঠবে? প্রত্যাশাটায় বাড়াবাড়ি হচ্ছে কি না, তা আইন কার্যকর হলেই বোঝা যাবে।

● আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
চিফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চিফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিনিয়র এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে